রাজ্যের সব রাজপথই ছিল ব্রিগেডমুখী

Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২ মার্চ, ২০২১

৪৪ বর্ষ ৯ সংখ্যা ১ মার্চ, ২০২১, সোমবার, ১৬ ফাল্গুন, ১৪২৭

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ ফেব্রুয়ারি : আজ বর্ধমান জেলার সব পথই যেন ছিল ব্রিগেডমুখী। বাস, লরি, ছোট হাতি, ছোট গাড়ি থেকে শুরু করে রেলপথে দলবদ্ধভাবে মানুষ আর মানুষ। বর্ধমান স্টেশনে সকাল থেকে সরগরম শ্লোগানে গানে। হাজার হাজার

—এরপর চারের পাতায়

বিধানসভা ভোটে ত্রিমুখী লড়াইয়ে ধর্মনিরপেক্ষ জোট এগিয়ে থাকবে : সূর্য্যকান্ত মিশ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ দশ বছর বাদে সন্ত্রাসের আগল ভেঙ্গে শহীদ প্রদীপ তা ও কমল গায়েন স্মরণসভা দেওয়ানদীঘিতেই করলো সিপিআই(এম) সদর-১ এরিয়া কমিটি। উল্লেখ্য ২০১২ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্যে দিনের আলোতে জনপ্রিয় দুই নেতাকে শাসকদল নিষ্ঠুরভাবে এই এখানেই পুলিশের সামনে নিষ্ঠুরভাবে পরিকল্পিত খুন করে। খুনিরা আজও প্রকাশ্যে ঘুরছে। একজনের ও বিচার হয়নি। সন্ত্রাসের আবহে স্মরণসভা ও করতে দেয়নি শাসকদল। ভয়ের আগল ভেঙে বাঁধভাঙা মানুষের ঢলে দেওয়ানদীঘি ২২ ফেব্রুয়ারি লাল ঝাণ্ডায় লালে লাল। স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের বিশাল সমাবেশে সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য ও রাজ্য কমিটির সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র দুই জনপ্রিয় নেতা লড়াকু প্রদীপ তা ও কমল

গায়েনকে স্মরণ করতে গিয়ে বলেন আজকের স্মরণসভা সার্থক হবে তখনই যখন খুনি শাসকদের হটিয়ে এবং তার দোসর বিজেপিকে আটকে বিকল্প বাম ও গণতান্ত্রিক জোটকে ক্ষমতায় আনতে পারবেন। তবে তৃণমূলের জল্লাদ বাহিনী শাস্তি পাবে। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন আমাদের প্রথম কাজ হলো মানুষের মধ্যে ভাগ করা আটকাতে সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী জোটকে ঐক্যবদ্ধ করা। একাজ তৃণমূল করতে পারবে না। দিদিই এনেছেন বিজেপিকে। ৩৪ বছরে বিজেপি মাথা তুলতে পারেনি। প্রয়াত জ্যোতি বসু বলেছিলেন আপনি বিজেপিকে ডেকে এনে রাজ্যের সর্বনাশ করবেন না। মানুষ শিক্ষা নিয়েছে। তাই এবার লোকসভার মত দ্বিমেরু লড়াই হবে না। ২০১৯ নয় ২০২১ ত্রিমুখি লড়াই হবে, ধর্মনিরপেক্ষ জোট এগিয়ে থাকবে।

শহিদদের স্মরণে কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার বলেন তাঁরা শাসকের কাছে মাথা নত করেনি। মানুষের মধ্যে ভাগ করার রাজনীতি আটকাতে গিয়ে খুন হতে হয়েছে। ২০১১ সালে খাল কেটে কুমির এনেছে, মানুষ, আবার খাল কেটে হাঙর আনবেন না। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদক ও সভার সভাপতি অচিন্ত্য মল্লিক।

সভাতে শহীদ প্রদীপ তা'র মা 'গণশক্তি' তহবিলে ১০,০০০ টাকা তুলে দেন রাজ্য সম্পাদক সূর্য মিশ্র-র হাতে। এছাড়া নবান্ন অভিযানে শাসকের দলদাস পুলিশের হাতে শহিদ মঈদুল ইসলাম মিদ্দা-র তহবিলে এবিপিটিএ সহ অনেকে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন।

কালনায় নির্বাচনী কর্মীসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে শিল্প নেই, শ্রমিকের কাজ নেই, বেকার যুবকদের চাকরি নেই। এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতির বদল ঘটাতে বাম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সরকার তৈরি করতেই হবে। কথাগুলি বক্তারা বলেন আজ অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনী কর্মীসভায়।

সিপিআই(এম)-এর কালনা-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে অষ্টগরিয়া হিমঘরে অনুষ্ঠিত এই কর্মীসভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম)-এর পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অঞ্জু কর, সুকুল শিকদার প্রমুখ। কর্মীসভা পরিচালনা করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা বীরেন ঘোষ। বক্তারা বলেন—পশ্চিমবঙ্গের সরকার প্রতারণার নীতি অবলম্বন করে

সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করছে। এই প্রচারণার বিরুদ্ধে আন্দোলন হলেই ফ্যাসিবাদী কায়দায় তা রোধ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। চাকরির দাবিতে ছাত্র-যুবদের নবান্ন অভিযানে পুলিশ দিয়ে আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। পুলিশের লাঠির আঘাতে যুবনেতা মইদুল ইসলাম মিদ্দা শহিদ হয়েছেন। মহিলা পার্শ্বশিক্ষক,

—এরপর চারের পাতায়

কৃষকসভা ও খেতমজুর ইউনিয়নের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : পাঁচশো টাকা বস্তা (৫০ কেজি) দরে কৃষকদের থেকে আলু কেনার দাবিসহ বিভিন্ন দাবিতে আজ কালনা-২ বিডিওকে স্মারকলিপি দিলেন কৃষক ও খেতমজুর ইউনিয়ন। অন্যান্য দাবির মধ্যে অন্যতম হলো হিমঘরে আলু লোডিং-এর সময় কৃষকদের থেকে আলু নামানো বাবদ কোন খরচ নেওয়া যাবে না। সারা ভারত কৃষক সভা ও সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের কালনা-২ ব্লক কমিটির উদ্যোগে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন মোহাম্মদ আলী, সনাতন টুডু, অশোক ব্যানার্জি, তপন মুখার্জি, শ্রীকুমার দুবে, মোহাম্মদ শাহ, অশোক ঘোষ প্রমুখ। এদিন কৃষক নেতৃত্ব জানান—কৃষি উপকরণের যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে তাতে কৃষকদের উৎপাদন খরচ অনেকটাই বেড়ে গেছে। সেই কারণে কমসে কম ৫০০ টাকা বস্তা দরে আলু বিক্রি না হলে, কৃষকদের চাষে লোকসান অবধারিত। অন্যদিকে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো হিমঘর মালিকরা এবার আলু সংরক্ষণে বাড়তি খরচের কথা ঘোষণা করেছেন। তাই কৃষক ও খেতমজুর ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ দাবি করেন—কৃষকদের উপর বাড়তি খরচের বোঝা চাপানো যাবে না।

সীমা নাশারী, এলাকার সবজি চাষিদের আশা বাড়িয়েছে

কিশোর মাকর

দক্ষিণ দামোদর নদীর তীর বরাবর মাটিতে সোনা ফলে। উর্বর জমিতে সারা বছর কোনো না কোনো ফসল চাষিকে অকৃপণ উৎপাদন দিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে সবজি চাষ এলাকার অথর্নীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু উন্নত মানের সবজির চারার অভাবে ঠকতে হয়েছে অনেকবার। এবার সেই অভাব পুরণ করে দিয়েছে, সীমা নার্শারি। জামনা গ্রামের চাষি বাপ্পা ঘোষ ১০ বিঘা সবজি চাষ করেন। বাইরে থেকে কয়েক বার হাইব্রিড দামি চারা এনেছেন। উৎপাদনে মার খেয়ে লোকসানে পড়েছেন। গত দু'বছর সীমা নার্শারি থেকে চারা নিয়ে লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছেন। তাছাড়া এই চারাতে রোগ পোকার আক্রমণ কম। ফলন ভালো। নব কুমার নায়েক ও চারাগাছের প্রশংসা করলেন।

সীমা নার্শারির মালিক মনসা রাম ঘোষ জানালেন আমি নিজেও আনাজ চাষে লোকসানে পড়েছি। মাধ্যমিক পাশ করে বাবার জমিতে আনাজ চাষে ঝোঁক বাড়ে। দূরদূরান্ত থেকে চারা এনে ঠকতে হয়েছে। তখন থেকেই চাকরির আশা না করে উন্নত জাতের বিজ্ঞানসমত হাইব্রিড চারা তৈরির কথা মাথায় আসে। জেলা উদ্যান পালন বিভাগের সহায়তায় প্রশিক্ষণ নিয়ে নার্শারি শুরু করি। পুঁজি বলতে নিজের দশ কাঠা জমি। উদ্যান পালন বিভাগের সাবসিডিতে বিজ্ঞানসম্মত পলি গ্রিনহাউস, সেচের ব্যবস্থা, বীজ প্রভৃতি দিয়ে হাতে কলমে সীমা নার্শারি গড়ে ওঠে। জেলা উদ্যান পালন বিভাগের আধিকারিক সমস্ত রকমের সহায়তা দান করেন। এখানে বেগুন, টমাটো, লঙ্কা, প্রভৃতি নানান প্রজাতির ৯০,০০০ চারা তিনটি লটে বিক্রি হয়। দুজন কর্মী নিযুক্ত করেছি। এলাকার চাষিদের চাহিদা মিটিয়ে বাইরের বাজার ধরতে ট্রান্সপোর্ট সহ আরও পরিকাঠামোর দরকার। তাছাড়া বিদেশি ভ্যারাইটিজ ফলের চারা তৈরি করছি। চাই পুঁজি। ব্যাঙ্কের দরজায় কড়া নাড়তে নাড়তে ক্লান্ত। ব্যাঙ্ক এগিয়ে আসতে চাইছে না।

জেলা উদ্যান পালন বিভাগের আধিকারিক কৃষ্ণেন্দু ঘড়াই জানালেন উন্নত জাতের সবজি চারার জন্য নার্শারি জেলাতে প্রথম। সমস্ত ক্ষমতা উজার করে সীমা নার্শারিকে দাঁড় করিয়েছি এলাকার মানুষের প্রয়োজনে। আমি বার্তা দিতে চেয়েছি বিকল্প ভাবনা থাকলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান তৈরি হয় অন্যদিকে এলাকার মানুষ পরিষেবা পায়। পলি গ্রিনহাউসটি বিজ্ঞানসম্মত উন্নত টেকনোলজি দিয়ে তৈরি। এর ভিতরে চারা নীরোগ হবে। বাইরের ভাইরাস, জীবাণু সবকিছু রোধ করার ক্ষমতা এর আছে। তিনি পরামর্শ দেন চাষির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। সীমা নার্শারি একদিন সীমানা ছাড়িয়ে সবজি চাষিদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

কেন বাম ধর্মনিরপেক্ষ জোটকে সমর্থন করব

বিকাশ কুমার ঝা

আমি একজন শ্রমিক। একটি বেসরকারি ক্ষেত্রে কারখানায় কাজ করি। আমি মনে প্রাণে চাই বামপন্থীদের নেতৃত্বাধীন জোট রাজ্যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক। সংসদে তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করুক যাতে দেশের বুকে ফ্যাসিবাদী তৎপরতা রোধ হয়। শ্রম আইন, কৃষি-আইন সহ সমস্ত জন-বিরোধী আইন প্রত্যাহার হোক। গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। শোষিত পীড়িত, দলিত, পিছিয়েপড়া জাত, ধর্ম নির্বিশেষে সব গোত্রের মানুষের মুখে আওয়াজ ফুটুক। ডিম-ভাত নয়, অন্তত সব মানুষ সামান্য শাকভাত খেয়েও নিরাপদে জীবনযাপন করতে পারে।

আমি দেখেছি বামপন্থীরা শ্রমিক-কর্মচারীদের সম্মানজনক বেতন সহ জীবনযাপনে ভালো সুযোগ সুবিধার জন্য লড়াই সংগ্রাম করে।

একমাত্র বামপন্থীরাই সব রকমের বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে। সামাজিক আর্থিক জাত-ধর্ম শিক্ষা সব ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বামপন্থীরা।

বামপন্থীরা সব অংশের শোষিত নিপীড়িত দলিতদের এই ব্যবস্থার মধ্যে সামান্যতম সুযোগ দিয়ে তাঁদের জীবনযাত্রার উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম করে। মণ্ডল আয়োগের সমর্থনে দেখেছি ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, সোমনাথ চ্যাটার্জী, সইফুদ্দিন চৌধুরী, বাসুদেব আচারিয়াদের মতো সাংসদরা সংসদ থেকে রাজপথে সওয়াল করেছিলেন। সেই সময়ের অনেক পুস্তক-পুস্তিকা খবরে কাগজে দেখলেই পাওয়া যাবে। ওবিসি-দের জন্য সংরক্ষণের দাবিতে বামপন্থীরাই সংসদে কংগ্রেস সরকারকে ঘিরেছিল। বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে সরকারকে আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছিল।

বামপন্থীরাই দেশের সব নাগরিকদের জন্য শিক্ষা ও কাজের দাবিতে আন্দোলন করে। অন্তত পক্ষে জনহিতকারী নীতির পক্ষে দাঁড়িয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দল যাঁরা মানুষের সপক্ষে কথা বলেন, পীড়িত, দলিত, পিছিয়েপড়া মানুষের কথা বলেন তাঁদের সঙ্গে কর্মসূচিভিত্তিক জোট করে লড়াই সংগ্রামে তৎপর থাকে। সরকারের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষে বামপন্থীরাই সর্বদাই সরব।

দেশের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদকে রক্ষা করা ও দেশের সব অংশের মানুষের জন্য উপযোগ করার সপক্ষে বামপন্থীরাই। বামপন্থীরা মনে করেন প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদগুলির সদ্ব্যবহার দেশের মানুষের স্বার্থে হোক, তাই এগুলি সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়, এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধিতা করে।

বামপন্থীরা ব্যাঙ্ক-বিমা,

—এরপর চারের পাতায়

নির্বাচনী ছড়া

তপোময় ঘোষ

না খেলা নয় ওটা হবে ভোট
এবং জিতবে বাম জোট
ভোট হবে, জোট হবে
খেলা নয় ভোট
জিতবে বাম-জোট
তোরা সবাই ফোট
ভোট নয় ছেলে খেলা
মত প্রকাশের এই বেলা
শাসক বাছার মহান ক্ষণ
খেলা নয় 'নির্বাচন'!
তা নিয়ে নয় হেলা ফেলা।
ওটা ভোট, নয় খেলা।।

নতুন চিঠি

১ মার্চ, ২০২১

সংযুক্ত মোর্চা

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক স্মরণীয় দিন হয়ে ইতিহাসে স্থান করে নিল ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১। এদিনই আত্মপ্রকাশ করল 'সংযুক্ত মোর্চা'। আগামী বিধানসভা নির্বাচন দুর্নীতিবাজ তৃণমূল ও সাম্প্রদায়িক বিজেপি এ দুই শক্তিই রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। সিন্ডিকেটরাজের রক্ষক, দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক, প্রমোদপ্রিয় স্বৈরাচারী তৃণমূল সরকারের ওপর রাজ্যের মানুষ তিতিবিরক্ত। লোকসভা নির্বাচনে 'শত্রুর শত্রু, আমার মিত্র' এই ভেবে অনেক মানুষ বিজেপিকে সমর্থন করে ফেলেন। আর.এস.এস-এর আদর্শের প্রতি অনুগত, বিজেপি এক ফ্যাসিস্ট শক্তি যার একমাত্র লক্ষ্য হল ভারতের সামাজিক বৈচিত্র্য ধ্বংস করে, সাম্প্রদায়িক বিভাজন ঘটিয়ে মসনদ দখল করে দেশের সম্পদ পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া। মধু নয়, সেঁকো বিষ ঘাসফুলে, পদ্মফুলে। রাজ্যের রাজনীতির মঞ্চে এরা ছাড়া আর কেউ নেই এমনটাই বোঝাতে চায় মিডিয়া। অতীতে একসাথে ভোটে লড়া থেকে সরকার চালানো এই দুই মিত্রশক্তি কি করে প্রতিপক্ষ হয়, মিডিয়া সে প্রশ্ন তুলে ধরেনি ইচ্ছাকৃতভাবেই।

কিন্তু রাজ্যের মানুষের সামনে একটি গ্রহণযোগ্য বিকল্প তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি ছিল। লেফট ফ্রন্ট শ্রেণি রাজনীতির আদর্শে বিশ্বাসী, সব পরিচয়ের ঊর্ধ্বে যে মানুষের উৎপাদনকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক পরিচয়, শ্রেণি রাজনীতির এটাই সার কথা। জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার সাংবিধানিক নির্দেশ মেনে চলা একান্তই আবশ্যক। বাম শক্তি ছাড়া বড় দলগুলির মধ্যে একমাত্র জাতীয় কংগ্রেস, দেশভাগের পর থেকে অদ্যাবধি এই আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেছে। তাই বিজেমূলের বিরুদ্ধে লড়াই-এ ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিনিধি কংগ্রেসকে সামিল করা সময়োচিত সিদ্ধান্ত। আর দুর্বল শ্রেণির ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার চিন্তা আজকের রাজনৈতিক বাস্তবতার বিশ্লেষণ থেকেই জন্ম নিয়েছে। আত্মপরিচয়ভিত্তিক সামাজিক ন্যায়ের আদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে আছে নতুন পার্টি—আই.এস.এফ, যারা আর ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহৃত হতে রাজি নয়, নিজেদের অধিকার আদায়ে আত্মপ্রত্যয়ী। বিভিন্ন রঙের সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্বকারী এই নবগঠিত দলটির ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র নামেই ঘোষিত।

শ্রেণি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও আত্মপরিচয়ভিত্তিক সামাজিক ন্যায়ের এরকম একটি যৌথ মঞ্চই যে মানুষ চাইছিলেন তা স্পষ্ট হল ব্রিগেডের সভায় জনজাগরণে। ছায়াযুদ্ধ লড়া তৃণমূল-বিজেপি অবশ্যই আতঙ্কিত, কারণ এই জোটকে ঠুনকো ও সুবিধাবাদী হিসাবে দেখাতে নেমে পড়েছে তাদের পোষা মিডিয়া ও আই.টি সেল। কিন্তু যেটা স্পষ্ট করা দরকার তা হল, এই সংযুক্ত মোর্চা রাজ্যে পরীক্ষিত তৃণমূল ও দেশে পরীক্ষিত বিজেপির অপশাসনের অবসানের প্রয়োজনে গঠিত মঞ্চ। বাম নেতৃত্ব এধরনের মোর্চার গুরুত্ব বোঝেন বলেই নিজেদের জেতা আসনও ছেড়ে দিয়ে জোটকে শক্তিশালী করতে তাঁরা দৃঢ়সংকল্প। বিগ্রেড দেখেছে যৌথ শক্তির তেজ—সেই তেজকে বুথস্তর পর্যন্ত নিয়ে লক্ষ্য অর্জনই আগামীর চ্যালেঞ্জ। রাজনীতি সম্ভাবনার চর্চা অবশ্যই, কিন্তু বাস্তবের সঠিক বিশ্লেষণ থেকেই বুঝতে হয় সম্ভাবনার চরিত্র। সংযুক্ত মোর্চা সংগঠনের মধ্যে প্রতিফলিত হল সেই পরিণত বাস্তব-বিশ্লেষণ, অগণিত মানুষের অংশগ্রহণই তার বড় প্রমাণ।

যুব সংসদে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ ফেরুয়ারি, দুর্গাপুর : আজ দুর্গাপুর ব্লাড ডোনারস্ ফোরাম ও নেহরু যুবকেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে 'ক্যাচ দি রেন'-এর ডাক দিয়ে এলাকার নাগরিকদের নিয়ে পদযাত্রার পর দক্ষিণায়ন উন্নয়ন সমিতির দক্ষিণী হলে শতাধিক তরুণ-তরুণীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো যুব সংসদ। উদ্বোধন করেন জেলা যুবাধিকারিক প্রদীপ সাহা। পরিবেশ সংরক্ষণ, পলিপ্যাক বর্জন, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, অপ্রচলিত শক্তির প্রসার, পণপ্রথার উচ্ছেদ, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন, কন্যাভ্রূণ হত্যারোধ, ড্রাগের নেশামুক্তি, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, কর্মহীন যুবক যুবতীদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে স্বাবলম্বিতা অর্জন, রক্ত ও দেহদানের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন নির্মল পান, লক্ষীকান্ত দে, কল্যাণ দেবনাথ, কাজল রায়। থিমের বিষয়ে দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমে স্লাইড সহযোগে বলেন বিজ্ঞান মঞ্চের রামপ্রণয় গাঙ্গুলী। ২৫ জন তরুণ-তরুণী বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপনে অংশগ্রহণ করেন। প্রথম চারজনকে পুরস্কৃত করা হয় এবং সকলকেই শংসাপত্র দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালক রক্তদান আন্দোলনের সংগঠক কবি ঘোষ। মোট ন'টি সামাজিক সংগঠন ও সংস্থা আন্তরিক ভাবে পাশে দাঁড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চে-র পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরা ও বুদবুদ-গলসী বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষে থেকে এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর ও কুলটি বিঃ কেন্দ্রের পক্ষে পদযাত্রা, পথসভা, আলোচনা সভা, লিফলেট প্রকাশ, পতাকা উত্তোলন ও স্যার সি ভি রমন-এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান প্রভৃতির মাধ্যমে আজ জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে পালন করা হয়েছে। এবারের ভাবনা ছিল বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনীর ভবিষ্যত ঃ শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানে প্রভাব। বিজ্ঞান মঞ্চের শ্লোগান ছিল বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করো, বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসার ঘটাও। সভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন অমল দাশ, শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও আশীষ চক্রবর্তী প্রমুখ।

কৃষক আন্দোলন এবং মানুষের অধিকার

দীপঙ্কর ঘোষ

এক রাজস্থানি ব্যবসায়ী ছিলো। গাড়ির ল্যুব্রিক্যান্টের ব্যবসা করতো। তার একটা ছোটো কারখানা ছিলো। সাইকেল, মোটর সাইকেল, গাড়ির গ্রিজ তৈরি হতো। রাজস্থানি বটে কিন্তু জন্ম কর্ম এই বাংলায়। বোধহয় ভুল হলো। এই রকম ছোটো ছোটো কারখানা সব প্রদেশের সব শহরেই ছিলো। অনামা কোম্পানি। ঘুরে ঘুরে দোকানে সাপ্লাই করতো। এরকম মানুষ গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ব্যবসা করতো। বিশ্বায়ন হোলো। মোবিল ভলভোলিন লুব্রিপ্লেট এইসব বিরাট কোম্পানি ভারতে এসে ঢুকলো। এদের শেকড় কিন্তু বিদেশের মাটিতে গাঁথা। এদের বিজ্ঞাপন-সাপ্লাইলাইন অনেক বড়ো। ছোটো ব্যবসায়ীরা হারিয়ে গেল। ছোটো ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপন আর অসম্ভব রকম ভালো সাপ্লাইলাইনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারলো না। যেমন হারিয়ে যাচ্ছে দর্জির দোকানগুলো। ঠিকই তো, একই দামে বা সস্তায় যদি সহজলভ্য জিনিস পাওয়া যায় তাহলে তো এরা কিছুতেই প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না। এটাই ক্যাপিটালিজম। এখানে দয়া-ধর্মের কোনও স্থান নেই। ক্রেতার জন্য অফুরন্ত পছন্দের সম্ভার থাকবে, সে তার পছন্দসই জিনিসটা খরিদ করবে, এটাই বাজারের নিয়ম অথবা পুঁজিবাদের নিয়ম। কিন্তু যেই মুহূর্তে নিজের প্রস্তুতি ছাড়া বিশ্বায়নের দরজা খুলে দেওয়া হবে তখনই বহুজাতিক কোম্পানি এসে আমাদের ক্ষুদ্র শিল্প শেষ করে দেবে। চীন নিজের শিল্পক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ লাভ করে প্রথমে বিদেশে সস্তা চীনা মাল বিক্রি আরম্ভ করে। ততদিনে তাদের মানুষ কিন্তু খাদ্যে আর শিল্পে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠেছে। এদিকে আমাদের দেশের ছোট কোম্পানিগুলো ডুবে গেল, আবার বড় কোম্পানি তাদের লভ্যাংশ নিজের নিজের দেশে নিয়ে যেতে থাকলো। ভারত ঋণের ভারে ন্যুব্জ কুব্জ হয়ে পড়লো। আমাদের অসংগঠিত শিল্পরা বাজার ধরতে পারলো না। শ্রমিকদের মাইনে দিতে পারলো না। শেষে অন্যের দোকানের মাসমাইনের কর্মচারী হয়ে মাথা নিচু করে জীবন কাটাতে লাগলো। না আমরা আমাদের কৃষিভিত্তিক দেশে কৃষির একটা সুসংহত বাজার তৈরি করতে পেরেছি—না আমাদের লুপ্তপ্রায় শিল্পক্ষেত্র সেটা পেরেছে। চাষি দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। চাষা মানেই কাদামাখা ছিন্নপিরান ছিন্নধুতি অস্থিপঞ্জরসর্বস্ব একটা ছবি ভাসে। অন্য কিছু তো মানাই যায় না।

তিনি আর কী কী করেছেন সেসব বিচারে না গিয়ে যদি আমাদের মহাত্মা গান্ধীর চরকা কাটা ছবিটার কথা ভাবি তাহলে মনে হবে উনি চরকাটায় আমাদের দীন দরিদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের কথা বলতে চেয়েছেন। অর্থাৎ ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের কথা। তাহলে আমরা কি বিদেশী ব্র্যান্ডেড কাপড়জামা পরবো না? অবশ্যই পরবো। আগে আপামর সাধারণ মানুষের বিকাশ হবে তারপর সেসব ভাবা যাবে। ততদিন দেশটাকে বিদেশী জিনিসের মুক্তাঞ্চল না করাই বোধহয় ভালো। দেশে মানুষ চিরজীবন ব্রিটিশ রাজত্বের ভজনা করে গেলো—মঙ্গল পাণ্ডে, ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করে গেল। যেখানেই এইসব বিপ্লবীদের কথা বলা হয়েছে, বা যে কাগজে এদের খবর ছাপা হয়েছে সেটাকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অবরুদ্ধ করা হয়েছে। দেশদ্রোহিতা? কোন দেশ রক্ত না ঝরিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে? নেতাজী সুভাষ বোস একটা অঘটন মাত্র। ব্রিটিশ ভয় পেল। সবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত। এই লোকটা জার্মান নয় জাপানিও নয় সম্পূর্ণ ভারতীয় অথচ সম্পূর্ণ ভারতীয় সৈন্যদল গড়ে, স্বাধীন সরকার গড়ে যুদ্ধ করতে আসছে। এমন তো হতেই পারে এর আগমনে দোর্দণ্ড ব্রিটিশ সেনা, যেটা মূলতঃ ভারতীয়দের দিয়েই বানানো, সেটা যদি সিপাহী বিদ্রোহের মতো দেশপ্রেমের নামে বিগড়ে যায় তাহলে বড্ড মুশকিল হবে। অলমিতি বিস্তারেণ। ফিরে আসি বর্তমানে।

আমরা অনেকেই চাকরমনোবৃত্তির মানুষ। চাষ বাস অতো বুঝি না। আমরা এখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করি। যখন দু হাজার ষোলোর পাঁচুই সেপ্টেম্বর জিও ভারতে আসে তখন তারা বিনা পয়সায় সার্ভিস দেওয়া চালু করে। বিএসএনএল যখন ফোর জি স্পেকট্রাম আনে (পাবলিক সেক্টর হিসেবে খরচটা মূলতঃ বিএসএনএল করেছিলো) তখন বিএসএনএল স্পেকট্রাম নিলামে ডাক পায়নি। এবার বিএসএনএল প্রায় লুপ্তপ্রায় প্রজাতি আর জিও সম্রাটের মতো মূল্য নির্ধারণ করছে। বিএসএনএল কর্মীরা কাজ করতো না এটা মস্ত একটা অভিযোগ। কিন্তু কোন সরকারি অফিসে সবাই ঠিকমতো কাজ করে? এদের অকর্মণ্যতা আসলে কিন্তু পরিচালকদের অক্ষমতা প্রকাশ করে। কৃষকদের কথা বলতে গেলে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এফসিআই)-এর কথা বলতে হবে। এফসিআই-এর কাজ হলো মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস (এমএসপি)তে কৃষকের কাছ থেকে ফসল কেনা (যেটা মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর ফসল তোলার আগে নির্ধারণ করে থাকে) এবং দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। যদি মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস না থাকে তাহলে এই পুরো সংস্থার কাজ কি দাঁড়াবে? অর্থাৎ আরও বহু সংস্থার মতো এটাও উঠে যাবে।

অন্যদিকে এক বস্তা আলু হিমঘরে রাখতে একজন চাষির বস্তাপিছু ষাট টাকা বছরে খরচ হয়। সেই বস্তায় যেহেতু সে অতো বেশি দাম পাবে না সেহেতু ওই আলু সে অল্প দামেই বেচে দেয়। এক্ষণে (আদানি গ্রুপ কিছুদিন আগেই দুশো ছিয়ানব্বই কোটি টাকায় ভারতের বৃহত্তম কোল্ড স্টোরেজ চেইন 'স্নোম্যান' কিনে নিয়েছে এবং দু হাজার সাত সালে মোগা নামের একটা জায়গায় এফসিআই এর সঙ্গে যৌথভাবে দেশের বৃহত্তম কোল্ড স্টোরেজ বানিয়ে নিয়েছে। এবার এফসিআই অকেজো হলে কী হতে পারে? আদানি এই আইনের পরে যথাসম্ভব শস্য কিনে মজুত করতে থাকে এবং দু এক বছর বিক্রি না'ও করে তাহলে এদের কিছুই এসে যাবে না, কেননা এখন আর অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ন্যূনতম মূল্য থাকছে না বা অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মজুতদারীও এখন আর বেআইনি নয়। এটাই বর্তমান কৃষক আইনের মোদ্দা কথা। এর ফলে দু-এক বছরের মধ্যেই কৃষকরা বাধ্য হবে কম দামে শস্য বেচতে অথবা দাদন নিয়ে (চাষের আগে টাকা নিয়ে) মালিকের মর্জিমাফিক চাষ করতে। সুধী পাঠকের এক্ষেত্রে নীলদর্পণ আর নীল বিদ্রোহ স্মর্তব্য। দু তিন বছর পর মূলধনের অভাবে ঐসব ছোটো ফড়েদের আর অস্তিত্বই থাকবে না। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, আদানি গ্রুপের মোট সম্পত্তি প্রায় দু লক্ষ আঠাশ হাজার কোটি টাকা। আঙ্কে আমি অঙ্কে কাঁচা, বহু কষ্টে একটা মোটামুটি হিসেব করেছি। ইনি ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তি। এহেন মানুষ আমাদের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য নিয়ে মজুতদারী করলে কৃষক তো কোন ছার, আমরা যারা তথাকথিত ভদ্রলোক তারা কেউও বাঁচবো না ।

অবশ্যম্ভাবী কয়েকটা প্রশ্ন আসে—

১) মাত্র এই কজন কৃষক কেন?

২) ওরা ঠাণ্ডায় মরছে আর আমাদের সেনাবাহিনী লাদাখে অবর্ণনীয় শীতের মধ্যে কাজ করে না?

৩) এরা তো সবাই ভালো পোষাক পরা ভালো খাবার খাওয়া লোকজন, এরা কি সত্যি সত্যিই কৃষক?

৪) হঠাৎ সরকার কী বুঝে এমন একটা আইন চালু করলো?

এক এক করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি ?

১) কোনও আন্দোলনেই একশো ভাগ মানুষ যোগ দেয় না, দেয়নি। সেটা সিপাহী বিদ্রোহ হোক বা রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই হোক বা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হোক। প্রত্যেকটায় কতিপয় দূরদর্শী মানুষ যোগ দিয়েছেন, সমর্থন করেছেন আর বাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ তদানীন্তন সরকারের হয়ে গান গেয়েছে। একমাত্র সুভাষ চন্দ্র সমস্ত দেশের সমর্থন পেয়েছিলেন। সবাই রেডিওতে কান পেতে শুনতো 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো'। হয়তো এটাই ব্রিটিশ সিংহের পালিয়ে যাওয়ার একটা বড়ো কারণ। তবু আমাদের সুভাষ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ভোটে হারেন।

২) সৈন্যদের একটা বিশেষ লক্ষ্য থাকে। দেশের সুরক্ষা। তেমনি চাষিদের একটা লক্ষ্য থাকে ফসল উৎপাদন করে দেশের মানুষকে রক্ষা করা। যদি পেট চালানো বা উপার্জনের কথা বলি তাহলে সেটা উভয় ক্ষেত্রেই সমান এবং প্রাথমিক প্রয়োজন। সুতরাং একজন সাধারণ মানুষ, হোক সে চাষি বা ভিখারি অথবা অভিবাসী শ্রমিক, তার অনাহারে মৃত্যু বা ঠাণ্ডায় মৃত্যু বা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু কোনো অবস্থায় কাম্য নয়।

৩) আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। তা সে মধ্যবিত্ত মধ্যচিত্ত জনগণ যতই বলুক আমাদের দেশের মূল উপার্জন চাষাবাদ। এবার আমাদের ভাবনায় চাষি হচ্ছে একজন ছেঁড়া জামা পরা বিনীত কুঁজো জোড়হস্ত একজন মানুষ। যার স্বপ্ন থাকে সন্তান লেখাপড়া শিখে চাকর হবে অর্থাৎ চাকরি করবে। আচ্ছা তাই যদি হয়, সব চাষির সন্তান যদি চাকরি করে, তাহলে ধান গম এগুলো কে ফলাবে? আসলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটাই কেরানি তৈরি করার। একজন কৃষক সন্তানের বা সূত্রধর সন্তানের উপযোগী কোনও পাঠ্যক্রম নেই। যেখানে সে মাটি চিনতে শিখবে, উন্নততর কৃষিবিদ্যা শিখে স্নাতক হবে, গবেষণা করবে, তাদের গাড়ি থাকবে, পরনে ভালো পোশাক থাকবে। তাই ভালো পোষাক পরা কৃষক দেখলে আমাদের চোখ টাটায়। ধূর, এ আবার কৃষক নাকি? কৃষক তো হবে মহাত্মা গান্ধীর মতোন। চড় মারলে বা শীতের রাতে গায়ে জল কামান চালালে অন্য গাল বাড়িয়ে দেবে অথবা নতমুখে বলবে আগামীকাল রাতে আবার জলকামান চালাতে আসবেন হুজুর। এদের ঠিক গরিব চাষাভুষোর ছাঁচে ফেলা যায়নি।

৪) সরকার ঊনিশশো আটচল্লিশ সালে প্রথম গ্যাট সমর্থন করে, তারপর ঊনিশশো পঁচানব্বই সালে গ্যাট চুক্তিতে সই করে। গ্যাটের বর্তমান নাম ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন। এখানে কিছু বাধ্য বাধকতা থাকে। বিশেষতঃ বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে। একটা উদার মুক্ত বাজার দিতে হবে যেখানে যে কোনও দেশ অন্য দেশে কম শুল্কে দ্রব্য বিক্রি ও খরিদ করতে পারবে। ঘটনাচক্রে একমাত্র একটা দেশের ওপর এই ওয়ার্ল্ড ট্রেডিং অর্গানাইজেশনর সব সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। সেটা হলো ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। সুতরাং ভারতের কিছু বাধ্যতা ছিলো।

—এরপর চারের পাতায়

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

বিশ্ব জল দিবসের প্রাসঙ্গিকতা

রামপ্রণয় গাঙ্গুলী

এখনও পর্যন্ত পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যেখানে জল পাওয়া যায়। জল আছে বলেই পৃথিবীতে প্রাণও আছে, যেজন্য সবুজ গ্রহরূপেও বসুন্ধরাকে অভিহিত করা হয়। আবার চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীকে নীলাভ দেখায় বলে একে 'ব্লু-প্ল্যানেট'ও বলা হয়। এখন দেখে নেওয়া যাক আমাদের প্রিয় বাসযোগ্য পৃথিবীতে জল কতটা আছে ও কি অবস্থায় আছে—

পৃথিবীর মোট জলসম্পদ
১৩৮৬ মিলিয়ন ঘন কিমি
(১০০ শতাংশ)

- সমুদ্রের লবণাক্ত জল (৯৭.২০ শতাংশ)
- স্বাদু জল (২.৮০ শতাংশ)
  - ভূপৃষ্ঠস্থ জল (২.২০ শতাংশ)
    - জলীয় বাষ্প (২.১৫ শতাংশ)
    - বরফ (০.০৮ শতাংশ)
    - ব্যবহারযোগ্য নদী, পুকুর ও বাঁধ (০.০১ শতাংশ)
  - ভূগর্ভস্থ জল (০.৬০ শতাংশ)

অর্থাৎ পৃথিবীর তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল শুনতে ভালো লাগলেও মানুষের ভাগে পড়ছে এতই স্বল্প যে এই গ্রহের ২২০ কোটি মানুষ নিরাপদ জল থেকে বঞ্চিত। এই বৈষম্যের অবসানকল্পে ইউনেস্কো ১৯৯২ সালের ২২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৯৩ সাল থেকে ফি বছর ২২ মার্চ দিনটি 'বিশ্ব জলদিবস' রূপে পালন করার আহ্বান জানায়। ২০২১-এর থিম 'জলসম্পদদের মূল্যায়ন' (Valuing Water).

এখন দেখবো পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অনুপাতে কোন্ মহাদেশে কত শতাংশ জল আছে। এশিয়ার জনসংখ্যা ৬০ শতাংশ, জল ৩৬ শতাংশ; আফ্রিকার জনসংখ্যা ১৩ শতাংশ, জল ১১ শতাংশ; ইউরোপের জনসংখ্যা ১৩ শতাংশ, জল ০৮ শতাংশ; দক্ষিণ আমেরিকার জনসংখ্যা ০৬ শতাংশ, জল ২৬ শতাংশ; উত্তর ও মধ্য আমেরিকার জনসংখ্যা ০৮ শতাংশ, জল ১৫ শতাংশ; অস্ট্রেলিয়া ও ওশেনিয়ার জনসংখ্যা ০১ শতাংশের কম, জল ০৫ শতাংশ।

কোথায় কত জল লাগে সেখানেও কি কোনো বৈষম্য আছে?

ব্যবহারের ক্ষেত্র	গার্হস্থ ব্যবহার	কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার	শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার
বিশ্বের গড়	০৮ শতাংশ	৭০ শতাংশ	২২ শতাংশ
উন্নত দেশগুলির গড়	১১ শতাংশ	৩০ শতাংশ	৫৯ শতাংশ
অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির গড়	০৮ শতাংশ	৮২ শতাংশ	১০ শতাংশ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিরকম, নিচের ছকে জানা যাবে (১৮০০ খ্রিস্টাব্দকে ভিত্তিবর্ষ ধরে কারণ ওই বছরেই পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ১০০ কোটি)। আশার কথা যে বৃদ্ধির হার স্বল্প হলেও তা কমের দিকে। ২০১৬, ১.১৪ শতাংশ; ২০১৭, ১.১২ শতাংশ; ২০১৮, ১.০৯ শতাংশ; ২০১৯, ১.০৭ শতাংশ।

১০০ কোটি বাড়তে কত বছর সময় লাগছে	বর্ধিত জনসংখ্যা কত হলো	খ্রিস্টাব্দ কত
১৮০০ বছর	০১ বিলিয়ন	১৮০০
১২৭ বছর	০২ বিলিয়ন	১৯২৭
০৩৩ বছর	০৩ বিলিয়ন	১৯৬০
০১৪ বছর	০৪ বিলিয়ন	১৯৭৪
০১৩ বছর	০৫ বিলিয়ন	১৯৮৭
০১২ বছর	০৬ বিলিয়ন	১৯৯৯
০১২ বছর	০৭ বিলিয়ন	২০১১
০১২ বছর	০৮ বিলিয়ন	২০১৩
০১৪ বছর	০৯ বিলিয়ন	২০৩৭
০১৮ বছর	১০ বিলিয়ন	২০৫৫
০৩৩ বছর	১১ বিলিয়ন	২০৮৮

দেখা যাচ্ছে যে গত শতাব্দীর (১৯০০-২০০০) মধ্যেই জনসংখ্যা বেড়েছে ৫০০ কোটি, এই জনবিস্ফোরণ সমস্ত রকম প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্কট সৃষ্টি করেছে, তাই জলসঙ্কটও তীব্র থেকে তীব্রতম হতে চলেছে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের অভাবে প্রতি বছর মারা যাচ্ছেন ৫০ লক্ষ মানুষ, ভারতে যে সংখ্যা দু'লক্ষ। প্রতিদিন অকাল মৃত্যু ঘটছে ছ'হাজার শিশুর। ২০১৯-এ রাজস্থানের ছাত্রছাত্রীদের দাঁড়াতে হয়েছে জল রেশনের লাইনে, রাজধানী দিল্লিসহ দেশের ২১টি শহর জল আতঙ্কে আক্রান্ত, শিল্প নগরী দুর্গাপুরে সাম্প্রতিককালে প্রতি গ্রীষ্মের দুঃখজনক জলছবি সুবিদিত। অন্যদিকে ২০১৯-এ বৃষ্টির ঘাটতির (রাজ্যে ৬-৩৫ শতাংশ, বর্ধমানে ৪৪ শতাংশ) জন্য ধানচাষ কম হয়েছে, জল নিয়ে কাড়াকাড়ি-মারামারিতে প্রাণহানিও ঘটেছে। এক্ষেত্রে সংবাদসংস্থা রয়টারের মন্তব্যটি (রাষ্ট্রসংঘকে উদ্ধৃত করে) অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক : ''Reuters Sustainablity : World has not woken up to water crisis caused by climate change. World scarcity could lead to conflit between communities and natians as the world is still not fully aware of the water crisis many countries face as a result of climate change, the head of the U.N. warns.'' তাই বিশ্বজোড়া চিন্তাবিদেরা বলছেন, ''আগামীতে যদি আরও একটি বিশ্বযুদ্ধ হয়, তবে তা হবে 'জল' নিয়েই।'' (রয়টারের প্রতিনিধি)

এমতাবস্থায় সোচ্চার হতে হবে ব্যারেজের পলি পরিষ্কারের (দুর্গাপুরে এই আয়তন ১০,২৭৩ মিলিয়ন ঘনমিটার, ব্যারেজের জল ধারণ ক্ষমতার ৩৫ শতাংশ) ভূগর্ভস্থ অমূল্য জলরাশিকে ব্যবহার করে সংকট যে মিটবে না বরং তা বাড়বে, যার ফল ভোগ করতে হবে অনাগত প্রজন্মকে তার প্রমাণ দিচ্ছে একটি তথ্য। আজ থেকে চার বছর আগে (১৯৯৩) বর্ধমান জেলা পরিষদ তথ্য প্রকাশ করে সতর্ক করেছিল যে অবিভক্ত বর্ধমানের ভূগর্ভস্থ জলের তল নেমেছে ৯.৩৮ মিটার, কমবেশি তিনতলা বাড়ির উচ্চতার সমান।

তাই ২৯তম বিশ্ব জলদিবস উপলক্ষে আমরা যা করতে পারি : (১) নতুন প্রজন্মকে বৃষ্টির জল সংরক্ষণে উৎসাহী করে তোলার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্ত

—এরপর চারের পাতায়

ওষুধ সম্পর্কে দু-চার কথা যা জানি মাত্র

প্রণব ভট্টাচার্য

গল্প শুরু করি।

প্রতিদিন এক মদ্যপায়ী মদ্যপান সেরে এসে প্রথম প্রথম র‍্যানট্যাক; জিন্ট্যাক চাইত। তারপর কম দামের মানে এক টাকার 'প্রহিবিন', তারপর 'অ্যাসিলক' আর তারপর এসে চায় 'ওমেজ'।

আমার কাছে নয়। ওষুধ দোকানের কাউন্টারে। কাগজের কৌটোটা দেখিয়ে দেয়। এভাবে অনেক দিন চলেছিল।

সেদিন দেখলাম অন্য একটা কৌটো দেখাল।

যার বেচা কাজ সে বেচবে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নাই।

সে নিল একটা রাবেপ্রাজোল ডমপেরিডন লেভোসালপিরাইড কম্বিনেশন। দাম ১৪ টাকা। মার্কেটেড বাই এক বড় কোম্পানি। ম্যানুফ্যাকচারড বাই পড়া যায় না এত ছোট লেখা। ব্যাচ নং এসব বাদ দিন। কে দেখে?

আমি বুঝি জেনেরিক প্রিপারেশন।

আমি তাকে শুধালাম, হ্যাঁ রে এটা নিলি কেন?

—ভাল কাজ করে। মনটা মাষ্টার ভালো থাকে।

ভাবলাম হ্যাঁ লেভো সালপিরাইডের একটা ভূমিকা আছে বটে মনের উপর। একটা ওয়েল বিয়িংনেস ভাব আনে।

আচ্ছা ইটোপ্রাইড; লেভো সাল পিরাইড এগুলো তাহলে বাজারে আছে। সাইড এফেক্ট-এর জন্য বন্ধ হবার কথা শুনেছিলাম। ভুল শুনেছিলাম হয়তো। যেমন ক্লোরামফেনিকল আছে। আরও কত যে রয়েছে। কত কম্বিনেশন। থিয়োরি অনুমোদন করেনা। করে না তো কি। আমি কোম্পানি। আমার নিজস্ব গবেষণা আছে। তার জন্য আমাকে দাম নিতে হয়।

বাজারে দেখছি কত নতুন নতুন কোম্পানির নাম।

গুজরাট; হরিয়ানা; হিমাচল প্রদেশের ঠিকানা সব।

গ্রাম-গঞ্জের ওষুধের বাজার ছেয়ে গেছে জেনেরিক ওষুধে।

দাম কিন্তু বড় বড় কোম্পানি ব্র্যাণ্ডেড ওষুধের মতোই।

তেমনই লেখা থাকে প্যাকেটের উপর। এবার যে যেমন বেচে।

মনের উপর কাজ করে যে ওষুধগুলো সেগুলো কাউন্টার থেকেই বিক্রি হয়। না নিষেধাজ্ঞা ছিল, না আছে।

বড় রাস্তার ধারে এক ওষুধ দোকানে বসেছিলাম।

মোটর বাইক নিয়ে দুজন যুবক এলো।

নামল। আঙুল দিয়ে চার দেখাল।

দুজনে দুটি করে চারটি নাইট্রোসান টেন ট্যাবলেট নিল।

দুটি করে একসাথে খেল। জলের বোতলটা কাউন্টার থেকে নিয়ে। তারপর যেমন উড়ে এসেছিল তেমনি উড়ে চলে গেল।

দাম দেয় সাত দশ দিন পরে বা সাথে সাথে।

ফেনসিডিল কফ সিরাপ খাবার জন্য গাড়ি নিয়ে আসেন এক ভদ্রলোক। তিনি ডিকিতে আগে থেকে প্যাক করে রাখা বাক্স তুলে নিয়ে বেরিয়ে যান।

আমি দেখি। তারাও দেখে।

যার বেচা কাজ সে বেচে।

ঠিক আছে। সব ঠিক আছে।

না। ঠিক নাই। ঠিক যে নাই তা অনেকেই বুঝছেন। কিন্তু—

মনোরোগ ক্রমাগত বাড়ছে। অনেক সময় তা ফেলে রাখছি। ডাক্তার-এর কাছে যাব। পাগল হলাম না কি।

আরে বাবা পাগলামি সে তো অনেক দূরের পর্যায়।

তার আগে ডাক্তার বাবুর কাছে যাও।

বারবার মন খারাপে ভুগতে ভুগতে একদিন যে রোগ চেপে বসবে। একই চিন্তা দুঃশ্চিন্তা বারবার মনে পাক খাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু যদি মনে করেন ওষুধের দরকার আছে। তিনি লিখবেন।

মনোরোগ একদিন মহামারির রূপ নেবে। আজ এ পৃথিবী মনোরোগাক্রান্ত।

ওষুধ। হ্যাঁ আছে। যদিও মন কে যে সব বুঝে উঠতে পেরেছি তা নয়। কিন্তু হাতে যা ওষুধ আছে তা দিয়ে অনেকটা ভালো থাকা যায়।

রোগ অসুখ আর ডাক্তার ওষুধের মাঝে তো আর কেউ নেই রে বাবা।

মনোরোগ-এর ওষুধগুলির যা দাম বাড়ল। প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলির ব্র্যাণ্ডেড ওষুধগুলির দাম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে—

সামান্য এমিট্রিপ্টিলিন; ক্লোর ডায়াজিপোক্সাইড থেকে শুরু করে এসসিটালোপ্রাম; সার্টালিন; প্রোথিয়াডিন; প্যারো বা ফেনোক্সেটিন আরও কত নাম—

উদ্বেগ; উৎকণ্ঠা দিন দিন বাড়ছে। আলপ্রাজোলাম; ক্লোনাজিপাম; কি লোরাজিপাম ছাড়া তো অনেকের চলছেই না। মনের মধ্যে কালো মেঘ পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে কেবলই।

এগুলো সব গাঁগঞ্জে কাউন্টারেই পাওয়া যায়। নানা জেনেরিক প্রোডাক্ট। দাম সেই নামী ব্র্যাণ্ডের মতোই।

বাজারে যে কত বলবর্ধক ওষুধ। নাম তাদের ফুড সাপ্লিমেন্ট। দেশি বিদেশি কত কোম্পানি নেমেছে। এত বড় বাজার এদেশের। কার না লোভ হবে। কত দেশি বিদেশি কোম্পানির নিউট্রিশন প্রোডাক্ট।

আর কত যে টনিক। যে দোকানে ডাক্তারবাবু বসেন, তার মালিক কে কিছু তো পাইয়ে দিতে হবে। সব জেনেরিক প্রোডাক্ট। একশো টাকার নীচে কোন দাম নেই। হ্যাঁ ডাক্তারবাবুরা লিখছেন।

সমস্যা নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে যাওয়ার আগেই ওষুধের দোকানদার ধরিয়ে দিচ্ছেন সিলডেনাফিল। চারটি ট্যাবলেট-এর দাম লেখা একশোর কাছাকাছি। এক দোকানদার সেদিন আমাকে বলল বীরভূমের গ্রামেগঞ্জে খুব বিক্রি। যে যা দামে পারে বেচে। বেচো বাবা বেচো।

গাঁ-গঞ্জে এই সব ওষুধ দোকানের বিক্রেতা (যদিও একটা ফার্মাসিস্ট লাইসেন্স) টাঙানো আছে সব দোকানেই। হতে পারে সেটা ভাড়ায়। যাই হোক জ্বর-জ্বালাতে এই সব মানুষেরাই ভরসা। আর গ্রামীণ ডাক্তার যাঁরা আছেন তাঁরাই।

কোথাও এমন গ্রামীণ ডাক্তার আছেন যাঁর একটা আর এম পি লাইসেন্স আছে শুধু। তাঁর পসার এবং আর্থিক প্রতিপত্তি শহরের বড় ডাক্তারদের চেয়ে বেশি। সব কাজ জানেন। দাঁত তোলা থেকে গর্ভপাত; এমন কি অপারেশন।

আমি অবাক হয়ে যাই তাঁদের দুয়ারে রোগীর ভিড় দেখে।

অনেককেই রাত্রে প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড বৃদ্ধির জন্য একটা ওষুধ নিতেই হয়। ট্যামসুলোসিন (ব্র্যাণ্ড নাম ইউরিম্যাক্স; ভেলটাম; ডায়নাপ্রেস ইত্যাদি) আর তার সাথে ফেনাস্টিরাইড বা ডুটা স্টেরাইড যুক্ত থাকলে তো কথাই নেই। দাম তিনশো থেকে চলল ঊর্ধ্বে—

অ্যান্টিবায়োটিকের দাম যে ভাবে বাড়ছে গ্রামের সাধারণ মানুষ কোর্স শেষ করতে পারছে না। আর হাসপাতাল সাপ্লাই-এর ওষুধে মানুষের কোন ভরসাই নেই।

তাহলে বাঁচব কীভাবে? না। টাকা না থাকলে আপনি বাঁচবেন না।

বাঙালি ডাক্তাররা কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে কেন মানুষ দক্ষিণে ছোটেন। আমাদের কাছের শহর দুর্গাপুরে অবাঙালি ডাক্তারদের দাম বেশি। বিতর্ক হবে। দেখুন বিজ্ঞাপন। হার্ট বা নার্ভের জটিল অপারেশন হবে। ডাক্তারবাবু আসবেন দক্ষিণ থেকে।

হায় বাঙালি, তোমার দিন গিয়াছে।

একদিন সারা ভারত আসত কলকাতায়।

কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করলে ব্র্যাকেটে লেখা থাকত (ক্যাল)। আর আজ? সবাই নিজেকে প্রশ্ন করুন।

হঠাৎ সেদিন নজর পড়ল 'ভারতীয় জনওষধী পরিযোজনা' নামের প্রকল্পের ওষুধ দোকানে। আলাপ হল মালিকের সাথে। তিনি ভিতরে ঢোকার অনুমতি দিলেন। আমি র‍্যাকগুলোতে চোখ বুলিয়ে দেখলাম প্রয়োজনীয় প্রায় সব ওষুধই রয়েছে।

আমি প্রথমেই ট্যামসুলোসিন ত্রিশটি নিলাম। অবাক হলাম দাম দেখে। মাত্র ৫৪ টাকা। কাজ করবে তো! মনে প্রশ্ন।

না, দেখলাম ঠিকই তো আছে।

এখন নিয়মিতই নিচ্ছি। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সব ওষুধ মিলিয়ে বাজার থেকে নিলে প্রায় ৪০০০ টাকা লাগত। এখন সব ওখান থেকে নিচ্ছি। পড়ছে বারো-চোদ্দশো টাকা।

কিন্তু এই দোকান তো আর হাতের কাছে নেই।

আর আমাদের ডাক্তারবাবুরা ব্র্যাণ্ডই লিখবেন।

আবার লিখবেন; বদলাবেন না।

রোগীর আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির কথা ভেবে ডাক্তারবাবুরা ওষুধ লিখছেন তো। গরিব এক সুগারের রোগীকে ওষুধ যদি লিখি ঐ গ্লিপটিন গ্রুপের কিনে খেতে পারবেন?

কাউকে জ্ঞান দিচ্ছি না। জ্ঞান আমি আর কী দেব?

একবার তেপান্তর নাট্য গ্রামে বাংলাদেশের এক দল এসেছিলেন নাটক নিয়ে। এক ভদ্রলোকের সাথে বসে গল্প করছিলাম। খাবার সময় হল। ভদ্রলোক পকেট থেকে বের করলেন সুগারের ওষুধ। বাংলায় লেখা 'গ্লিবিজাইড'।

বাংলায় ওষুধের নাম লেখা দেখে বাঙালি হিসাবে আমার স্বাভাবিক আনন্দ হল। আবার একটু ভাবলাম। একটু পিছনের জেনারেশেন-এর ওষুধ। আমি খাই 'গ্লিমেপিরাইড'।

ওঁদের দেশে সব ওষুধই জেনেরিক। ব্র্যাণ্ডের বহর নাই।

উনি বললেন, দেখুন গরিব দেশ। কম দামের ওষুধ দিয়ে যদি রোগ ভালো হয়।

আর আমরা যেন বড়লোক।

হ্যাঁ। যারা বড়লোক তারা বড়লোক।ওখানেও তাই। কিন্তু আপামর জনগণ।

তাদের সংখ্যাটা সঠিক ভাবে নিরূপিত হোক।

আর তার বিপরীতের সংখ্যাটাও।

কার কত দেনা তাও প্রকাশিত হোক।

লিস্টি টাঙ্গিয়ে দেওয়া হোক।

ওষুধের বাজারটা দেখা হোক।

—এরপর চারের পাতায়

একুশ ঃ শ্রদ্ধা ও শ্রাদ্ধ

নীলা কর

আরও একটি নতুন ধরনের বৃদ্ধাবাস জরুরি এখন।

কর্পোরেট সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিক প্রয়োজনেই
বাংলা ভাষা ব্রাত্য বহুদিন।
এবং ক্রমশ
ক্রমশই গ্লোবাল সভ্যতার সুধী নাগরিকত্বের
তীব্র এবং অনিবার্য টানে
শুধু জননী জন্মভূমিই নয়
বাংলা ভাষাও পরিত্যক্ত বহুকাল।

তবু একুশ ফিরে আসে বারবার
রক্তে চুবিয়ে তুলি
আঁকে বাংলার মুখ, বাঙালির মুখ
বহু শহিদের গরবী মুখ।
আর তখনই প্রযুক্তি শোনায়
''একদিন বাঙালি ছিলাম রে''.....
হ্যাঁ এখনও সবুজ ঘাস শিশিরে ভেজায় পা
কিছু শীত ভোরের চাদর খোঁজে
গুগুল ছেড়ে কয়েকটা মানুষ
রেওয়াজে আওয়াজ তোলে
''আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি'...
আর তারপরেই বৃদ্ধাবাসে ফিরে আসা বাংলার
আবার ব্রাত্য বাংলা থাকুক
ডিকশনারি আতুড়ঘরে—
হঠাৎ হঠাৎ দমকা হাওয়ায় যখন জানলা খুলে যাবে
বাংলা এখন অল্প হলেও বাঁচুক রবীন্দ্র-চর্চায়।

একুশের শ্রাদ্ধবাসরে আজও গাইছি তাই
''আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।''

বাহান্নর শপথ

মনামী ঘোষ

ক্যালেণ্ডারের একুশে লাল
রক্তলেখা
অশোক পলাশ শিমুল রাঙা
শোণিত রেখা
ভোরের সূর্য আগুন হানে
দিগ্বিদিক
বরকত বা সালাম জাব্বর
আর রফিক
কুসুম কোমল মা'র আঙুল
আগ্নিফোঁটা
রক্তনদীর স্রোত উজিয়ে
গর্জে ওঠা
আমার কথায় আমার ভাষা
আমার গান
বাহান্নর সে অঙ্গীকারেই
প্রাণের টান।

অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীর দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : সিপিআই(এম) গলসী-১ এরিয়া কমিটির সদস্য হারাধন ঘোষের স্ত্রী, অমরপুরের অঙ্গনওয়ারী কর্মী মাধবী ঘোষ (৩৫) আজ সকালে কলকাতার হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। গতকাল পুরসা হাসপাতালে করোনার টিকা নিয়ে তিনি হাইওয়ে অতিক্রম করার সময় দুর্গাপুরগামী একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা মারে। প্রথমে বর্ধমান হাসপাতাল, পরে কলকাতার পিজি হাসপাতালে পাঠানো হয়। আজ সকালে তার মৃত্যু হয়েছে। মাধবী ঘোষ রেখে গেছেন স্বামী হারাধন ঘোষ ও তাঁদের একমাত্র কলেজ পড়ুয়া পুত্রকে। সিপিআই(এম) জেলা এবং গলসী ১ ও ২ এরিয়া কমিটির নেতৃবৃন্দসহ প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

পালসিট সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ৫

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি, মেমারি : পূর্ব বর্ধমানের মেমারি পালসিটের কাছে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ১১জন আহত ও ৫ জনের মৃত্যু হয়। পালসিট এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে এদিন সন্ধ্যায় স্বস্তি পল্লী এলাকা থেকে জাতীয় সড়কের দুর্ঘটনাস্থল পর্যন্ত একটি মৌন মোমবাতি মিছিল হয়। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পালসিট সংযোগ স্থলে আন্ডারপাশের। গতকাল ৪ জনের মৃত্যুর পর আজও একজনের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে মেমারি থানার ওসি দেবাশীষ নাগের তৎপরতায় গত রাতেই ট্রাকসহ ড্রাইভার দেবেন্দ্র প্রসাদ হরিজনকে শক্তিগড় থেকে গ্রেফতার করা হয়।

নাম/পদবী পরিবর্তন

☐ I Bharati Chonre W/o Lakshmi Chonre resident Raina Dule Para P.O. & P.S Raina District– Purba Bardhaman-713421 by an affidavit before the executive Magistrate Purba Bardhaman on 20th Jan 2021 hereby declare that my name is recorded as Bharati Chonre is all testimonials and documents. I have changed my name as Bharati Soren in place of Bharati Chonre. Bharati Chonre & Bharati Soren is one & same identical person.

☐ I Lakshi Chonre S/o Janaki Chonre resident of Raina Dule para, P.O. & P.S Raina District Purba Bardhaman-713421 by an affidevit before the Executive Magistrate on 20.01.2021 hereby declare that my name Lakshi Chonre is recorded in my all testimonials & document. I have changed my name as Lakshi Soren in place of Lakshi Chonre. Lakshi Chonre & Lakshi Soren is one & same, identical person.

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : কালনা-২ ব্লকের কৃষক আন্দোলনের নেতা মহাদেব প্রামাণিকের (৭৬) জীবনাবসান হয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন থেকেই শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন। তাঁকে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় আজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃতদেহ ঝকরপাড়া গ্রামের বাড়িতে নিয়ে এলে সিপিআই(এম) নেতা, কর্মী ও অনুরাগীরা সেখানে উপস্থিত হন। প্রয়াতের মরদেহ রক্ত পতাকা ও ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান মোহাম্মদ আলী, মহম্মদ শা, আলিম মণ্ডল, নবকুমার বাগ, অশোক ঘোষ, সুরজিৎ বাগ, গোপেশ্বর গাঙ্গুলি প্রমুখ। কালনা শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সমাধা হয়। মহাদেব প্রামণিক ছয়ের দশকে খাস জমি ও কৃষক বর্গা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সিপিআই(এম)-এর সংস্পর্শে আসেন। ১৯৭৭ সালে পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন। ১৯৮০ সালে খেতমজুরের মজুরি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা ছাড়াও ১৯৭৭ সাল থেকে পরপর পাঁচবার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য পদে জয়ী হন।

ব্রিগেডমুখী

—প্রথম পাতার পর

মানুষ চলেছেন ব্রিগেডের উদ্দেশে। অশীতিপর থেকে শুরু তরুণ-তরুণী কিশোর-কিশোরীরা সকলেই চলেছেন ব্রিগেডের দিকে। আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনে জনতার ব্রিগডকে মজবুত করতে। যাঁরা বাসে ট্রাকে ছোট গাড়িতে ছিলেন তাঁদের ঘন্টাখানেক আটকে থাকতে হয় ডানকুনি টোলপ্লাজার আগে পুলিশ ও প্রশাসনের অসহযোগিতার কারণে এমনি অভিযোগ ব্রিগেডমুখী মানুষদের। মিছিল বা সমাবেশের গাড়ি যাবে তাকে আটকাতে হবে তাই কৃত্রিম যানজট তৈরি করেছিল হুগলির পুলিশ প্রশাসন লরি ট্যাঙ্কার দিয়ে। কিন্তু মানুষের ঢলকে কি রোখা যায়? ব্রিগেডমুখী মানুষ পথে নেমেই পাথের সন্ধান করে নিয়েছিলেন। ট্যাঙ্কার-লরির অবরোধ সরিয়ে ব্রিগেডমুখী পথকে সুগম করেছিল। পুলিশের প্রশাসনের তৎরপরতা তার পর লক্ষ্য করেন ব্রিগেডমুখী মানুষ। রাস্তাও ছিল জনসমুদ্রে দুর্বার।

কৃষক আন্দোলন এবং মানুষের অধিকার

—দুয়ের পাতার পর

যে কারণে নিজের শিল্পের সম্ভাবনা বাদ দিয়ে খোলা বাজারে নেমে পড়তে হয়। নিজেদের শস্য ব্যক্তিগত মালিকানায় ছেড়ে দিয়ে ভবিষ্যতে বিদেশ থেকে চাল গম আমদানি করার বাধ্যতা মেনে নিতে হয়। কৃষকের আন্দোলন মূলতঃ এরই বিরুদ্ধে। আপনি অবশ্যই বিরোধিতা করবেন কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠ চিরকালই সরকারি পক্ষ অবলম্বন করেছে।

লেখক : পেশায় চিকিৎসক

কালনায় নির্বাচনী কর্মীসভা

—প্রথম পাতার পর

হবু শিক্ষক সহ বিভিন্ন প্রকল্প কর্মচারীদের আন্দোলনের উপর লাঠি চালানো হয়েছে।

সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে ২৪ ফেব্রুয়ারি সেনেরডাঙা হিমঘরে অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মীসভা পরিচালনা করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সনাতন টুডু। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার। তিনি বলেন— এই লুম্পেনরাজ রুখতে মেহনতি, প্রান্তিক, তপশিলি, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সহ সর্বস্তরের গরিব মানুষের অধিকারে লাগাতার আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সিপিআই(এম) সহ বামপন্থী ও সহযোগী দলের বৃহত্তর ঐক্য গড়ে উঠেছে। আদর্শ, নীতি আর লক্ষ্যে স্থির থেকে সমাজের সর্বস্তরের আক্রান্ত মানুষের ঐক্যকে আরো মজবুত করার প্রয়াস চালাতে হবে। কারণ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একটা জনমত তৈরি হয়েছে। এই বিরুদ্ধ জনমতকে হাতিয়ার করেই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে।

জোটকে সমর্থন করব

—প্রথম পাতার পর

স্কুল-কলেজে হাসপাতালের মতো জরুরি পরিষেবা ক্ষেত্রগুলি সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার পক্ষপাতী। সর্বাধিক ভালো ব্যবস্থানার মাধ্যমে সব মানুষকে এই পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসতে চায়।

বামপন্থীরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্যোগকে সমর্থন করে যাতে ব্যাপক মানুষের কর্মসংস্থান হয়, বেকার কর্মদ্যোগীদের জন্য সহজ ব্যাঙ্ক-ঋণের ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে কর্মসংস্থানকে বাড়ানোর পক্ষে সওয়াল করে।

বামপন্থা লুটেরা নবউদারবাদী নীতির বিরুদ্ধে। এ নীতি হল বড় নির্মম ও নিষ্ঠুর এবং মানবতা বিরোধী।

বামপন্থীরা বড় সৎ ও নিষ্ঠাবান। তারা মানুষের জন্য কাজ করেন। মানুষকেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনে করেন।

বামপন্থীরা সংবিধান প্রদত্ত ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করে। বামপন্থীরা মনে করেন ধর্মীয় বিষয়ে রাষ্ট্র কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। এর পাশাপাশি বামপন্থীরা সামাজিক চিন্তা চেতনার পরিবর্তনের বিষয়ে মানুষকে সর্বদা সচেতন করে।

আমি মনে করি সংসদে বামপন্থীদের অনুপস্থিতির কারণে আজ শ্রম ও শ্রমিক-বিরোধী আইন লাগু হয়েছে, কৃষি ও কৃষক-বিরোধী কানুন লাগু হতে চলেছে। তাই বাম-গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির পক্ষে ভারসাম্য বদলানো জরুরি।

বিশ্ব জল দিবসের প্রাসঙ্গিকতা

—দুয়ের পাতার পর

স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জলের মূল্যায়ন সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কর্মসূচি গহণ (২) জল ব্যবহারকারী কৃষকদের মধ্যে এলাকা ভিত্তিক কমিটি করে জলসম্পদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারে সচেতন করে তোলা (৩) নির্বিচারে ব্যক্তিগত মুনাফার স্বার্থে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন অবিলম্বে বন্ধ করার আইন তৈরি ও তার সুষ্ঠু প্রয়োগ (৪) মানুষের জীবনধারণে নদীর গুরত্ব অপরিসীম, খ্যাত-অখ্যাত সমস্ত নদীর সুষ্ঠু সংরক্ষণ পুনরুজ্জীবনের জন্য রাষ্ট্রের ওপর চাপ তৈরি করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ (৫) স্থানীয় এলাকার জলসম্পদ মানচিত্র প্রকাশ ও তথ্য সর্বসাধারণের নজরে আনার জন্য প্রশাসনের ওপর চাপ তৈরি (৬) ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ (আর্সেনিক, ফ্লোরাইড, নাইট্রেট প্রভৃতি) ও প্রতিকারের বিষয়ে জনচেতনা বৃদ্ধি করা এবং সর্বোপরি সামাজিক স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে 'চেতনা জাঠা'/কনভেনশন/প্রচার সহ লোক সংস্কৃতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সংস্কৃতির সমস্ত ধারাকে প্রয়োগ করা।

ওষুধ সম্পর্কে দু-চার কথা

—তিনের পাতার পর

লক্ষাধিক ব্র্যাণ্ড। কোটি কোটি মানুষ। লক্ষাধিক কোটি টাকার ওষুধ ব্যবসা।

ওষুধের মান নির্ণয়ের জন্য সংস্থা আছে। তাঁদের সত্যি কোন কাজ আছে কি না জানা নেই আমার। ওষুধের এফিকেসি বা বায়োএভেলিবিলিটি নিয়ে এত প্রশ্ন সংশয় কেন তাহলে।

হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা কি হাসপাতালের ওষুধ-এর উপর ভরসা রাখেন! নিজের বুকে হাত দিয়ে বলুন।

তাঁরা খুব ভালই জানেন স্যাম্পেল টেস্টিং-এর সময় যে মাল পাঠানো হয় আর বাজারজাত করার মাল এক নয়।

আরও অনেক কথা বলা বাকি থাকল। বলব।

আপনারা যাঁরা আমাকে জানেন চেনেন তাঁরা বলবেন, আরে মশাই আপনি আবার আঞ্চলিক ইতিহাস ছেড়ে ওষুধে এলেন।

কী ব্যাপার! রঙ বদলালেন না কি? ট্র্যাক চেঞ্জ?

না। না। মোটেই না। আমার অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী না হয় যেন বাবা—আমি দেখি চারিদিকে চলে শুধু লুঠ।

রঙ বেশ জটিল ব্যাপার। লুঠের কি কোনো রঙ আছে, না কি রঙের রসায়ন আছে।

হলুদে মেটালিক ইয়োলো মেশানোর গণিত কেশব নাগে নাই।

দুধে জল মেশানোর আছে। মেনে নিয়েছি—ছিল। আছে। থাকবে।

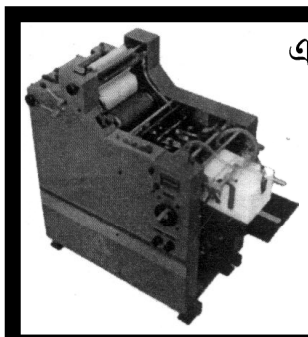

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

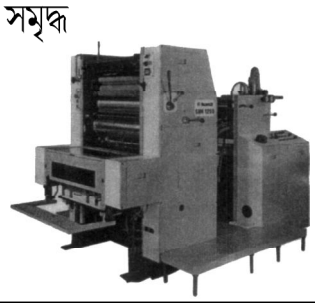

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা